জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪০:২০২১ (পৃ. ৫৯-৬৮)
Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 40:2021 (pp 59-68) *ISSN 1027-8567*

সন্দ্বীপ উপজেলার দুর্যোগের প্রকৃতি ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা: রিমোট সেনসিং ও জিআইএস ভিত্তিক একটি গবেষণা

মোঃ সানজিদ ইসলাম খান[১], কাজী নেওয়াজ মোস্তফা[২], ফারজানা জান্নাত[৩]

১ সহকারী অধ্যাপক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। sikhan@brur.ac.bd
২ সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। knm.eco@brur.ac.bd
৩ প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। farzana.stat93@brur.ac.bd

সারাংশ: বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার একটি উপজেলা সন্দ্বীপ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে প্রায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই দ্বীপ মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় দ্বিমুখী স্রোত সন্দ্বীপ-এর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ নদীর পাড় ভাঙ্গন ঘটায়। অন্যদিকে নদীবাহিত পলি জমে সন্দ্বীপের উত্তর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্রমাগত নতুন ভূমি তৈরি হচ্ছে, যা ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অনন্য উদাহরণ। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল সন্দ্বীপে ঘূর্ণিঝড় এর প্রভাব ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার তুলামূলক চিত্র তুলে ধরা ও সন্দ্বীপের ভূমি ক্ষয় ও জমা হবার কারণ এবং মাত্রা অনুসন্ধান করা। গবেষণাটিতে একদিকে জিআইস পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের অবস্থান ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, রিমোট সেনসিং পদ্ধতি ব্যবহার করে সন্দ্বীপের ভূমি ক্ষয় ও পলি জমা হওয়ার পরিমাণের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করে জিআইএস পদ্ধতির মাধ্যমে মানচিত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে এই ভূমি ক্ষয় বা জমা হওয়ার জন্য নদী ও সমুদ্রের মোহনার দ্বিমুখি স্রোতের গতির তারতম্যে প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া আরও দেখা যায় যে, পলি জমার ফলে উত্তরে নিকটতম এলাকার সাথে একটি সংযোগ পথও তৈরি হচ্ছে যার ভৌগলিক গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বর্তমানে নদী ভাঙ্গন এবং পলি সঞ্চয় এর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ২০১৪ সালের পরের স্যাটালাইট ইমেজ পর্যবেক্ষন করলে আমরা নদী ভাঙ্গন বা পলি সঞ্চয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাই না। এছাড়াও আমরা বিশ্লেষণে পেয়েছি ঘূর্নিঝড় কেন্দ্রের পরিমাণ জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনায় অসমভাবে বিন্যস্ত। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে দরকার স্থায়ী ও টেকসই প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে উপকূলীয় বনায়ন একটি চমৎকার সমাধান হওয়া সত্ত্বেও তা পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে না। অস্থায়ী কিছু ব্যবস্থাপনা প্রতিবছরই দেখা যায় যা একেবারেই অপ্রতুল এবং শুধুমাত্র সরকারের অর্থ ও শ্রমের অপচয়। তাই প্রকৃতির বৈচিত্রপূর্ণ এই দ্বীপকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন পরিকল্পিত দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন ব্যবস্থা। নতুন জেগে উঠা ভূমির জন্য নেওয়া হয়নি কোন টেকসই পরিকল্পনা। কাজেই সম্ভাবনাময় এই দ্বীপ ক্রমেই পরিণত হচ্ছে দুর্যোগের সহজ শিকার হিসেবে। ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় সন্দ্বীপের যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হতে পারে সারা পৃথিবীর জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

মূলশব্দ: সন্দ্বীপ, দ্বীপ, জিআইএস, দূর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়

ভূমিকা

সন্দ্বীপ মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ এলাকা। বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত এই দ্বীপের আয়তন প্রায় ৭৬২ বর্গ কি. মি.। দ্বীপটির সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো এটি ক্রমাগত বাড়ছে অথবা কমছে। কারণ হিসেবে একই সাথে বিপরীতধর্মী দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। একদিকে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল যেমন প্রবল ভাঙ্গনের সম্মুখীন হচ্ছে, আবার অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম অববাহিকায় পলি জমে নতুন ভূমিস্তর তৈরি হচ্ছে। এমন দ্রুত গতিশীল ও চমকপ্রদ ভূমি পরিবর্তন বাংলাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না (Alam, 2009)। তাছাড়া বিচ্ছিন্ন ও উপকূল এলাকা হওয়ার ফলে মার্চ থেকে জুলাই ও নভেম্বরে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৭টি প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় নথিভুক্ত হয়েছে (Burrogh, 1986)।

অন্যদিকে দেখা যায় যে, মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় তীব্র দ্বিমুখী স্রোতের সৃষ্টি হয় (Das, 2012)। এই ঘূর্ণনশীল স্রোতবাতাসের গতিপথ সন্দ্বীপের উত্তর পশ্চিম থেকে পশ্চিম উপকূল ঘেষে চলে যায় ও পাড় ভাঙ্গন ঘটায়। এই পর্যন্ত সন্দ্বীপের দুইটি ইউনিয়ন সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে (Irtifa, 2014)। নদীর তীর ঘেষে ম্যানগ্রোভ বনায়ন নদী ভাঙ্গনের একটি সমাধান হতে পারে। তবে পরিকল্পিত এই বনায়ন করতে সরকারি উচ্চ মহলের সহযোগীতা ও একটি উন্নত পরিকল্পনা দরকার। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জোয়ার প্লাবিত কাদা অঞ্চলে “গ্রীনবেল্ট” প্রকল্পের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ বনায়ন কর্মসূচী চলছে (Moshen, 1999)। কিন্তু সন্দ্বীপের ক্ষেত্রে এই বনায়ন কিছুটা লক্ষ্য করা গেছে শুধু দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে (Khan, 2014)। অথচ এই বনায়ন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের ভাঙ্গন কবলিত এলাকায়। তবে লক্ষনীয় বিষয় এই যে, ঐ স্থানে ম্যানগ্রোভ বনায়নের মতো উপযুক্ত জোয়ার বিধৌত মাটি নেই। তাই এই সমস্যার একটি বাস্তব ও সুদূর প্রসারি সমাধান প্রয়োজন।

আবার সন্দ্বীপে নদীর স্রোত বাহিত পলিমাটি জমা হওয়ার কারণে গতিপথের শেষ পর্যায়ে এসে নদী তার গতি হারিয়ে ফেলে। ফলাফল স্বরূপ, সাথে বয়ে নিয়ে যাওয়া পলিমাটি সমুদ্রতলে জমা হয়। এক্ষেত্রে এই স্রোত সন্দ্বীপের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাধা পেয়ে সেখানেই পলি আকারে জমা হয়েছে। ফলে দেখা যায়, সন্দ্বীপের ভাঙ্গা-গড়ার হার প্রায় সমান থাকে (Das, 2012)। বরং ধারণা করা হয়, এক সময় সন্দ্বীপে গড়ার হার তুলনামূলক ভাবে নদী

[১] যোগাযোগের ঠিকানা: ✉ sikhan@brur.ac.bd

ভাঙ্গনের থেকে বেশি হবে ও নতুন ভূমি সৃষ্টির হার বাড়বে (Akter, 2014)। এই ভাঙ্গা গড়ার ফলে সন্দ্বীপের ভৌগলিক অবস্থানও পরিবর্তিত হচ্ছে। দেখা গিয়েছে, ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ভেঙ্গে বিলীন হচ্ছে ও উত্তর-পূর্বাচঞ্চল বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ভৌগোলিক অবস্থান বলতে যা বুঝানো হয় সেই হিসেবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ পরিবর্তিত হচ্ছে। যদিও সন্দ্বীপের আয়তন ও বহিঃপরিসীমার এখন পর্যন্ত নিরেট কোনো অবস্থান পাওয়া যায় না। লক্ষনীয় বিষয় হল, সরকারি মানচিত্রে সন্দ্বীপের প্রশাসনিক সীমানা যেমন দেখা যায় তা স্যাটেলাইট চিত্রে প্রাপ্ত সীমানা থেকে কিছুটা ভিন্ন (Khan, 2014)।

সন্দ্বীপের এই ক্রমবর্ধমান ভূমি ক্রমাগত নিকটবর্তী উত্তারাঞ্চলের ভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছে যা ভূ বিজ্ঞানীদের গবেষণা মতে একদিন এই দ্বীপটিকে মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত করবে। স্যাটেলাইট চিত্রের গবেষণাতেও এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে (Khan, 2014)। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে উপকূলবর্তী এলাকার স্যাটেলাইট চিত্র থেকে লক্ষ্য করলে পানিতে মাটির উপস্থিতি ও উপকূলবর্তী গড়ে উঠা নতুন ভূমির রূপ দেখা যায়। তবে এই গবেষণা লব্ধ ফলাফলের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব নয় কারণ সেডিমেনটেশন বা পলি মাটি জমার প্রক্রিয়াটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার গতিবেগ পূর্বে অনুমান করা যায় না। তবে সন্দ্বীপে বসবাসকারীদের মধ্যে নদীভাঙ্গন একটি আতংকের নাম যার ফলে অনেক মানুষকে নিজের সব সহায় সম্পত্তি হারিয়ে পাড়ি জমাতে হয়েছে অন্য এলাকায়।

এ যাবত কালের ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ পর্যন্ত সন্দ্বীপের উপর দিয়ে ৯ থেকে ১০টি প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে যার মধ্যে ১৯৪৮, ১৯৬৩, ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় অন্যতম। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ইতিহাসের অন্যতম ভয়ংকর ও প্রায় ৩০ হাজার মানুষ মারা যায়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়ে সন্দ্বীপে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ মারা যায়।

সারনী ১ঃ সন্দ্বীপে ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকারী কিছু ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড়ের সময়কাল	তীব্রতা
১৮২২ (অক্টোবর)	তীব্র
১৮৭৬ (৩১ অক্টোবর)	তীব্র
১৯৪৮ (১৭-১৯ মে)	প্রচন্ড তীব্র
১৯৫৮ (২১-২৪ অক্টোবর)	তীব্র
১৯৬৩ (২৮-২৯ মে)	প্রচন্ড তীব্র
১৯৭০ (১২-১৩ নভেম্বর)	ইতিহাসের অন্যতম ভয়ংকর
১৯৯১ (২৯ এপ্রিল)	বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়ংকর
১৯৯৪ (২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে)	তীব্র
১৯৯৮ (১৬-২০ মে)	তীব্র

সুত্র- বাংলাপিডিয়া

এই গবেষণাটিতে মূলত স্যাটেলাইট ইমেজ ও জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। রিমোট সেনসিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্যাটেলাইট ইমেজের সাহায্যে নদী ভাঙ্গন, নদী সঞ্চয়, বনায়ন, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইত্যাদি বের করা হয়েছে। রিমোট সেনসিং পদ্ধতির সাহায্যে স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে খুব সহজেই দূরবর্তী স্থানের ভূমিরূপ ও ভূমি ব্যবহার সমন্ধে ধারণা পাওয়া যায় (Anou, 1999)। জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করে ম্যাপ প্রস্তুতি ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাই গবেষণাটিকে জিআইএস ও রিমোট সেনসিং ধর্মী গবেষণা বলা যেতে পারে। স্রোতের গতিবেগ এবং গতিপথ সম্পর্কে যে হাইপোথিসিস বা ধারণা করা হয়েছে তা গবেষণা এলাকা ভ্রমন করে পর্যবেক্ষন এবং প্রমাণ করা হয়েছে। তাছাড়া রিমোট সেনসিং থেকে পাওয়া উপাত্ত গবেষণা এলাকা পরিদর্শন করে খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং উপাত্তগুলো অনুসন্ধান করে ফলাফল বের করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা কর্মের মূলত প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমত: সন্দ্বীপ উপকূলবর্তী এলাকা বিধায়, ঘূর্ণিঝড় এই অঞ্চলের প্রধান দুযোর্গ। শুধু দুর্যোগকালীন নিরাপদ কেন্দ্রে অবস্থান করা ছাড়া এই দুর্যোগের তেমন কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। অতএব, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের সংখ্যা ও বিন্যাস সন্দ্বীপের বাসিন্দাদের জন্য যথেষ্ট কি না তা অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ, এর উপর এই দ্বীপ উপজেলার বাসিন্দাদের দূর্যোগকালীন সুরক্ষা নির্ভর করে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্দ্বীপের নদীক্ষয় ও পলি জমা হবার কারণ ও মাত্রা অনুধাবন করা। কারণ, এই অনন্য ভূপ্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের আর কোনো অঞ্চলেই নেই তথা পৃথিবীব্যাপি এই ভূমিরূপ একটি অপ্রতুল ঘটনা যা একই সাথে একটি দুর্যোগ ও আর্শিবাদ। এর ফলে সন্দ্বীপের মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হবার যে সম্ভবনা আছে তার জন্য প্রয়োজন একটি যথাযথ ব্যাবস্থাপনা যার মাধ্যমে ক্ষয় রোধ ও পলি জমা ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং, এই ব্যাপারে প্রয়োজন আরও বিস্তারিত গবেষণা। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এ সংক্রান্ত গবেষণার ঘাটতি পূরণে আলোচ্য গবেষণাটি একটি সূচনা মাত্র।

গবেষণাটিতে সন্দ্বীপের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তার প্রতিরোধে বা প্রশমনে গৃহিত ব্যবস্থা অপ্রতুলতা কি না তা দেখানো হয়েছে। এটি হতে পারে দেশের অন্যান্য দ্বীপ এলাকার জন্য একটি উদাহরণ। এর উপর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা প্রয়োজন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। তাই একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই পরিকল্পনা হতে পারে সবার জন্য দৃষ্টান্ত। এই গবেষণাতে পরিকল্পনা নেওয়ার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। যা থেকে পরবর্তী গবেষণা ও এই সংক্রান্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

পূর্ববর্তী গবেষণা প্রবন্ধের পর্যালোচনা

সন্দ্বীপের এই অনন্য সাধারন ভূমিরূপ ও তার স্থানিক পরিবর্তন নিয়ে বিগত দশকের আগে তেমন কোনো গবেষণা পাওয়া যায় নি। বর্তমানেও যে গবেষণাগুলো হয়েছে সেখানে সমন্বয়হীনতা

লক্ষ্য করা গেছে। তবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব নিয়ে সত্তরের দশকের শেষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক গবেষণা হয়েছে, যেখানে বার বার সন্দ্বীপের নাম উঠে এসেছে (যেমনঃ Das, 2012; Khan, 2014 ইত্যাদি)। আবার নদীভাঙ্গন প্রবণ এলাকা হিসেবেও কোনো কোনো গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে (যেমনঃ Akter, 2014)। তাছাড়া গত দশকে, বিশেষ ভাবে সন্দ্বীপের ভূমিরূপ ও ব্যবহার, নদীভাঙ্গন ও পারিপার্শ্বীক অবস্থা নিয়ে কিছু গঠনমূলক গবেষণা হয়েছে যা এই অঞ্চলের ভূমিরূপ ও তার গঠন প্রকৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য ও দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক গবেষককে উৎসাহিত করেছে।

সন্দ্বীপের ভূমির গঠন ও ভৌগলিক বৈচিত্রের সমন্ধে প্রথম গবেষণা হয় ২০০৯ সালে একটি অপ্রকাশিত থিসিস কর্মে (Alam, 2009)। এই গবেষণা কর্মে সন্দ্বীপের মোহনা পার্শ্ববর্তী উপকূলে একই সাথে নদী ভাঙ্গন বা ভূমিক্ষয় ও অপর পাশে নদী সঞ্চয় বা পলিমাটি জমা হবার প্রবনতা লক্ষনীয়ভাবে দেখানো হয়। গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিম উপকূলে নদী ভাঙনের কথা আবার উত্তর-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম উপকূল ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ভাঙনের কারণে অসংখ্য মানুষ বাস্তহারা হয়েছে। কিন্তু, ভাঙন বা সঞ্চয়ের হার ও মাত্রা কিংবা কারণ গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া নদীভাঙ্গন মোকাবেলায় যথাযথ ব্যাবস্থাপনা কি হতে পারে সে ব্যাপারে কোনো ধারনা দেয়া হয়নি।

সন্দ্বীপের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দূর্যোগ হলো ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সন্দ্বীপের যে ক্ষয় ক্ষতি হয় তা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয় (Burrogh, 1986) যাতে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ও কারণ অনুসন্ধান করা হয়। গবেষণাটিতে প্রাচীন সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সন্দ্বীপের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বেশ কিছু প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ও দূর্যোগ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে যার ফলে মানুষজন যথাসময়ে ও যথাযথ ভাবে প্রস্তুত হতে পারে না। তাছাড়া, ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি ও হতাহতের জন্য দূর্যোগকালীন মানুষের অজ্ঞতাকে দায়ী করা হয়েছে। গবেষণাটিতে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের অপ্রতুলতার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই গবেষণা মতে বাংলাদেশের কোনো উপকূলবর্তী এলাকার যথেষ্ট পরিমাণে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নেই। যার ফলে আপদকালীন মানুষ দ্রুত নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে পারে না। তাছাড়া উপকূল বা দ্বীপ এলাকার মানুষের আপদকালীন মানসিক টানাপোড়েনের কথা গবেষণাটিতে উঠে এসেছে। উল্লেখ্য যে, অনেকে নিজের ঘরবাড়ি বা গবাদি পশু ফেলে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চায় না। এজন্যে তিনি তাঁর গবেষণায় যথাযথ দূর্যোগ প্রশিক্ষন ও শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে যে জলোচ্ছ্বাস দেখা যায় তাকে আরো ভয়াবহ আখ্যা দিয়ে দৈত্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। জলোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রনে এই উপকূলবর্তী এলাকা সমূহে যে যথাযথ কোনো ব্যবস্থাপনা নেই তাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই গবেষণায় শুধু ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের সংখ্যার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর যথাযথ বিস্তৃতি এর ব্যাপারে কোনো আলোচনা করা হয়নি। তাছাড়া ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের বিভিন্ন সুবিধা বা সমস্যার কথাও গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয় নি।

Das (2012) তাঁর গবেষণায় মেঘনা নদী বা বঙ্গোপসাগরের মোহনার স্রোতের কারণে অববাহিকার ভূপ্রকৃতিতে ও ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে সন্দ্বীপকে আখ্যা দেন। তাঁর রচিত গ্রন্থে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরসহ বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন স্রোত ও স্রোতের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারন বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে শুরু করে মহীঢাল ও মহাসোপান অতিক্রম করে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এর অবস্থান। এই গভীর অঞ্চলে সকল পলি কনা বা নদীবাহিত মাটি জমা হয়। বাংলাদেশের নদীগুলোর শেষ আশ্রয়স্থল হলো বঙ্গোপসাগর। নদীগুলো গতি হারিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় সাথে বয়ে নিয়ে আসে পলি ও মাটি বা পাথরকনা। আবার বঙ্গোপসাগরে ঢালের কারণে স্রোতের গতি বৃদ্ধি পায়। এই দ্বীমুখি স্রোতের কারণে নদী ভাঙ্গন ও পলি সঞ্চয় এর ঘটনা ঘটে। তবে এর পিছনে স্রোতের বেগের তারতম্যও অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা যায় নদীর নিম্নমূখী কম বেগের স্রোত কোন ভূখন্ডে বাধা পেলে সেসব স্থানে পলি সঞ্চয় করে। আবার নদী ও সাগরের মোহনার তীব্র স্রোত অভিমুখে ভাঙ্গন ঘটায় যা সন্দ্বীপের ঘটনার সাথে সম্পূর্ন মিলে যায়। কিন্তু এই গবেষণায় নদীভাঙ্গন বা পলি সঞ্চয়ের পরিমাণ বা হার সমন্ধে কিছু বলা হয়নি। তাছাড়া বিশ্বের কোথাও এমন আরও কোনো ঘটনা ঘটছে কিনা এই ব্যাপারে কোন নথি নেই।

সন্দ্বীপের নদীভাঙ্গনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা যায় আরেকটি অপ্রকাশিত গবেষনাপত্রে (Irtifa, 2014) এই গবেষণাটি ছিলো মৌজা ভিত্তিক গবেষণা। উল্লেখ্য, এই গবেষণায় আর এস মৌজা ব্যবহার করে সন্দ্বীপের মৌজা বহিঃসীমানা দেখানো হয়েছে। আবার তা বর্তমান সীমানার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই তুলানামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে, সন্দ্বীপের স্বাধীনতা পূর্ববতী ও পরবর্তী সময়ের দুই ইউনিয়ন যা বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে সেগুলো হলো আজিমপুর এবং হারামিয়া ইউনিয়ন। নদীভাঙ্গনে দক্ষিন-পশ্চিম থেকে পশ্চিম উপকূলবর্তী এই দুইটি ইউনিয়ন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। তবে এই গবেষণাতেও ভূমি সঞ্চয়ের ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

নদীসঞ্চয় বা পলি মাটি জমা হয়ে উপকূল বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সন্দ্বীপের ক্ষয় ও বৃদ্ধি নিয়ে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা মূলক একটি গবেষণা কর্মে (Akhter et al., 2014)। এই গবেষণা কর্মে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাত্ত সংগ্রহ করে সন্দ্বীপের

বহি:সীমা নির্ণয় করা হয়েছে এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ক্ষয়-বৃদ্ধির পরিমান নির্ণয় করা হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে সন্দ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ভাঙ্গছে এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব অর্থাৎ সমগ্র উত্তর উপকূলে পলি সঞ্চয় হচ্ছে। প্রথম দিকে ভাঙ্গার পরিমাণ বেশি ছিলো, পরে ক্রমান্বয়ে পলি সঞ্চয় বাড়ে। ফলশ্রুতিতে এক সময় ভাঙ্গাগড়ার হার সমান ছিলো। বর্তমানে আবার পাড় ভাঙ্গার পরিমাণ বাড়ছে। একই সাথে সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এই হার-এর কারণ সমন্ধে গবেষণায় কোনো ব্যখ্যা দেয়া হয়নি। তবে এ কথা উল্লেখ্য যে, এই ভূতাত্ত্বিক কার্যক্রমের ফলে মানচিত্রে সন্দ্বীপের আকার, আয়তন ও অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে।

স্যাটেলাইট চিত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে ভাঙ্গা গড়ার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। একটি দ্বীপ এলাকার ভূমি গঠন ও পরিবর্তন এবং ধীরে ধীরে তা উন্নত এলাকায় পরিবর্তন ঘটে (Anou, 1999)। গবেষণা প্রবন্ধটি মূলত ভূমিরূপ পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবহারের উপর লিখিত হয়েছে। কিন্তু দ্বীপ এলাকার বিবেচনায় এই গবেষণা নতুন ধারনা দিতে সক্ষম। যদিও ভূমি ক্ষয় বা সঞ্চয় নিয়ে কোনো আলোচনা নেই, শুধু ভূমিরূপ পরিবর্তন নিয়ে রিমোট সেনসিং ও জিআইএস ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রিমোট সেনসিং ও জিআইএস ব্যবহার করে এই ধরনের গবেষণা করা সম্ভব তার প্রথম ধারনা এই প্রবন্ধে পাওয়া গেছে।

স্যাটেলাইট রিমোট সেনসিং ও জিআইএস পদ্ধতি ব্যাবহার করে সমন্বিতভাবে ভূমি ক্ষয় ও পলি সঞ্চয় এর ব্যপারে জানা যায় আরেকটি অপ্রকাশিত গবেষণা কর্মে (Khan, 2014)। গবেষণাটিতে ঐতিহাসিক উপাত্ত ব্যাবহার করে স্রোতের গতিবেগের সাথে সমন্বয় করে ভাঙ্গা-গড়ার একটি তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন উচ্চতায় স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে পলি মাটির পরিমাণ দেখানো হয়েছে, যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব। গবেষণা কর্মটিতে ধারনা করা হয়েছে হাই রেসুলেশন ও কম উচ্চতায় স্যাটেলাইট চিত্রে অগভীর পানিতে জমাকৃত পলি মাটিতে প্রতিফলন দেখা যাবে যা নদী বা সাগরে ভাটার সময় আরও পরিষ্কার পরিলক্ষিত হয়। তবে এই গবেষণাতে উল্লেখ করা হয়নি যে, জমাকৃত পলি খালি চোখে দৃশ্যমান হওয়ার জন্য কি পরিমান সময় লাগতে এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও ধারনা দেওয়া হয়নি।

ঘূর্ণিঝড় ও নদী বা পাড় ভাঙ্গনের প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্যতম হচ্ছে উপকূলীয় বনায়ন (Mohesn, 1999)। সরকার 'গ্রীন বেল্ট' ও 'ডেল্টা প্ল্যান' প্রকল্পের আওতায় উপকূলবর্তী সকল এলাকায় বনায়ন করতে চায়। এলক্ষ্যে উপকূলবর্তী এলাকায় কাদাযুক্ত মাটিতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান চলছে। কিন্তু এই বৃক্ষরোপন যে ফলপ্রসূ নয় তা দেখা গেছে আরেকটি গবেষণা কর্মে (Khan, 2014)। এই গবেষণাতে সন্দ্বীপের ভূমি ব্যবহার নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে সন্দ্বীপের পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকায় বনায়ন করা হচ্ছে যদিও ঐ এলাকায় নদীভাঙ্গন নেই। তাছাড়া এটি সমুদ্র উপকূলও নয়। তাই বনায়নের জন্য উপযুক্ত এলাকাটি নির্ধারন করা প্রয়োজন। তবে এই গবেষণা কর্মে বনায়নের আদর্শ এলাকা বা অন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

পূর্ববর্তী গবেষণা প্রবন্ধসমূহের পর্যালোচনার মাধ্যমে পাওয়া ধারনা থেকে এই গবেষণায় একটি যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারন করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। যেমন, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের অপ্রতুলতার কথা বলা হয়েছে। তাই এই গবেষণায় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের বিন্যাসের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় নদীর দ্বিমুখী স্রোত, পাড় ভাঙ্গন ও পাড় সঞ্চয়ের কথা বলা হয়েছে। এই গবেষণায় স্রোতের সাথে পাড় ভাঙ্গন ও পাড় সঞ্চয়ের সম্পর্ক ও পরিমাণ দেখানো হয়েছে। তাছাড়া রিমোট সেনসিং ও জিআইএস পদ্ধতিতে ভূমিরূপ ও এর ব্যবহরের পরিমাণ কিছু গবেষণা কর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই গবেষণায় তা সমন্বিত ভাবে দেখানো হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা এলাকা

সন্দ্বীপ একটি প্রাচীন দ্বীপ যা বামনী ও মেঘনা নদী দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও মীর সরাইয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে সন্দ্বীপ চ্যানেল বলা হয়। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে হাতিয়া দ্বীপ ও উত্তরে নোয়াখালির চর হাইম অবস্থিত। ১৪ টি ইউনিয়ন, ৪০ টি মৌজা ও ৪২ টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত পুরো সন্দ্বীপ দ্বীপটি প্রশাসনিকভাবে চট্টগ্রাম জেলার একটি উপজেলা।

চিত্র ১: সন্দ্বীপের প্রশাসনিক মানচিত্র

এখন প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের বসবাস এই দ্বীপটিতে। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবি। কিছু পরিবার নিয়ে একটি বাড়ি অবস্থিত এবং প্রত্যেক বাড়িতে তিন বা ততোধিক পুকুর আছে যা পানি পান সহ দৈনদিন কার্যে ব্যবহারিত হয়। তাছাড়া গভীর নলকূপ ও আছে। দ্বীপটির সরকারি বিদ্যালয়গুলো সাধারণত উঁচু করে বানানো ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পাঁচটি কলেজ ও প্রায় ৩০টি হাই স্কুল আছে। মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলের প্রায় ৮৮% মানুষ মুসলিম (Banglapedia, 2013)। দ্বীপ অঞ্চল হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা খুব ভাল নয়। প্রায় ৯০ কি.মি. কাঁচা পাকা সড়ক আছে। মূল ভূখন্ড থেকে যাতায়াত এর এক এবং একমাত্র মাধ্যম জলপথ। চট্রগ্রাম উপকূল থেকে এর দুরত্ব ২২ নটিকাল মাইল।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

জিআইএস হচ্ছে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিষ্টেম, যার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো স্থানের যে কোনো ভৌগলিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করা যায় ও ভৌগলিক চিত্র প্রদর্শন করা যায় (Likens, 1982)। অন্যদিকে, স্যাটেলাইট রিমোট সেনসিং হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি যার দ্বারা পৃথিবীর যেকোনো স্থান সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় (Jensen, 1986)। সমন্বিত ভাবে এই গবেষণায় স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে গবেষণাটিতে মূলত জিআইএস ও রিমোট সেনসিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা হয়েছে (Anderson, 1976)। জিআইএস প্রযুক্তির সাহায্যে গবেষণা এলাকার মানচিত্র (চিত্র ১) তৈরি করা হয়েছে। স্যাটেলাইট চিত্র থেকে রিমোট সেনসিং পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করে জিআইএস এর সাহায্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার মানচিত্র (চিত্র ২) তৈরি করা হয়েছে। রিমোট সেন্সিং ভিত্তিক গবেষণার জন্য স্যাটালাইট ইমেজ অত্যাবশ্যক (Mathur, 1990)। হাই রেজুলেশন স্যাটালাইট ইমেজের মূল্য খুব বেশি হওয়ায় তা সব সময় গবেষণার জন্য ব্যবহার করা যায় না (Civco et al., 2002)। তাই গবেষণার জন্য আমরা নির্বাচন করেছি মধ্যম রেজুলেশনের SPOT স্যাটালাইট ইমেজ, যার রেজুলেশন হল ৫ মিটার, যা এই গবেষনার জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য গবেষণার জন্য ব্যবহৃত ইমেজ স্পারসো এর আর্কাইভ থেকে নেয়া হয়েছে। নদী ভাঙনের ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষন, যা টাইম 'সিরিজ এনালাইসিস' নামে পরিচিত, এই পর্যবেক্ষণ করার সবথেকে নিখুঁত পদ্ধতি হল রিমোট সেনসিং। নদী ভাঙ্গনের মাত্রা ও তীব্রতা এবং সময়ের সাথে এর পরিবর্তন রিমোট সেনসিং এর সাহায্যে সহজেই নির্ভুল ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। এই গবেষণায় ঠিক তাই করা হয়েছে। নদীভাঙ্গন ও নদী সঞ্চয় এর উপাত্ত সন্দ্বীপের উপর হয়ে যাওয়া একটি গবেষণা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে (Akhter, 2014)। তাছাড়া নদীর পলি সঞ্চয় এর পরিমাণ ও পাড় বৃদ্ধির মান স্যাটেলাইট চিত্রের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে পাওয়া ছবির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের সংখ্যা দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনসংখ্যা উপাত্ত ব্যবহার করে প্রভাব আয়তন নিরূপন করা হয়েছে। এই প্রভাব অঞ্চল ধরা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় এলাকার ১ মাইল পরিসীমার মধ্যে। এই পরিসীমার মধ্যে বসবাসকারী লোকজনকে ঐ ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের সুবিধাভোগী ধরা হয়েছে। প্রভাব অঞ্চল ও জনসংখ্যা ঘনত্ব থেকে নিরূপন করা সম্ভব যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা জনসংখ্যা অনুপাতে যথেষ্ট কি না। তাছাড়া দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের উপাত্ত থেকে সন্দ্বীপের উপর ঘটে যাওয়া এ যাবতকালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। স্রোতের দিক ও বেগ নিরূপনের জন্য ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার ব্যবহার করা হয়েছে (Kostachuk, 2005)। কার্যত এসব তথ্য উপাত্তের সাথে রিমোট সেনসিং ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া গুগল আর্থ ইমাজারি ব্যবহার করে পলি সঞ্চয় ও উত্তর উপকূলের সীমা বৃদ্ধির উপাত্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত Arc GIS 10.5 সফটওয়্যার এর সাহায্যে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

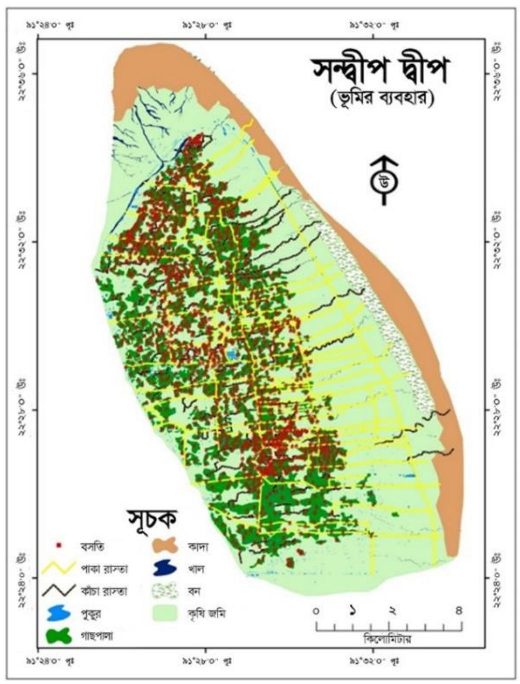

চিত্র ২: সন্দ্বীপের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র

ধারনাগত কাঠামো

দ্বীপ

দ্বীপ বলতে মহাদেশ থেকে আয়তনে ছোট চারিদিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগকে বোঝায়। এটি হতে পারে লেক, নদী, সাগর বা মহাসাগরের ভিতরে (Pelling & Uitto, 2011)। এই গবেষণাটিতে দ্বীপ বলতে শুধু বাংলাদেশের সন্দ্বীপ উপজেলাকে বোঝানো হয়েছে যা বঙ্গোপসাগরে একটি দ্বীপ অঞ্চল।

দ্বীপ অঞ্চলের দুর্যোগ

পৃথিবী ব্যাপী একেক দ্বীপের দুর্যোগ একেক রকমের হয়। কোনটিতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয় আবার কোনটি সাইক্লোন, সুনামি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় (Ofori, 2002)। আলোচ্য গবেষণায় দুর্যোগ বলতে সন্দ্বীপ উপজেলায় ঘটিত মূলত ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিক্ষয়কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

ফলাফল ও বিশ্লেষণ

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বিন্যাস

প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সন্দ্বীপের মোট ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮৭ টি। যদি অনান্য দ্বীপ অঞ্চলের কথা চিন্তা করি তবে সে তুলনায় এই সংখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক। সন্দীপের পাশ্ববর্তী দ্বীপ হাতীয়ায় মোট আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩০ টির মত, এবং দ্বীপ জেলা ভোলায় এই সংখ্যা ৬৭৮ টি (Chowdhury, 2015)। তবে সন্দ্বীপের মতো ভৌগলিক এবং ভূতাত্ত্বীক বৈচিত্র বাংলাদেশের কোনো দ্বীপ অঞ্চলেই নেই, তা পৃথীবিতেও বিরল, যা গবেষণায় এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুপাতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে প্রভাব অঞ্চলে বিন্যস্ত করলে দেখা যায়, অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ঘূর্ণিঝড় প্রভাবমুক্ত অঞ্চলে রয়েছে অর্থাৎ দুর্যোগ বা ঘূর্ণিঝড়কালীন তারা অতিদ্রুত নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবে না। প্রাপ্ত গবেষনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের পোর্টাল এ দেখা গেছে জায়গা ভেদে আশ্রয়কেন্দ্রের দূরত্ব সর্ব্বোর্চ .৫ কিমি বেশি হওয়া উচিত নয় এবং .২৫ কিমি হল অত্যানূকুল দূরত্ব। আবার অনেক স্থানে দেখা যাচ্ছে (চিত্রঃ ৩) কিছু প্রভাব অঞ্চল একে অন্যের ভেতরে চলে এসেছে, অতএব খুব কাছাকাছি একাধিক আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। অপরিকল্পিত ভাবে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করার কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যা ও আয়তনের অনুপাতে সন্দ্বীপে যথেষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু অপরিকল্পিত ভাবে নির্মানের জন্য অপর্যাপ্ত বলে মনে করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রর অবস্থান এমন হওয়া উচিৎ যাতে আপদকালীন সময়ে সবাই অতিদ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে, এবং আশ্রয় কেন্দ্র তার এলাকার সব মানুষের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করতে সক্ষম। কিন্তু এই গবেষণায় সন্দ্বীপের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর স্থানিক বিন্যাস ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী বিন্যস্ত নয়। কিছু এলাকায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে, আবার কোনো কোনো এলাকায় জনসংখ্যার তুলনায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। পরিকল্পিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অভাব এই অসমাঞ্জস্যতার মূল কারণ। তাছাড়া স্থানীয় অভিপ্রয়াণ এর কারনেও এই বিচ্যুতি ঘটেছে। কারণ যাই হোক না কেনো এর ফলে এই জনবসতির ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ ও ক্ষতিগ্রস্থতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সুষম ও প্রয়োজন মাফিক বিন্যাস নিশ্চিত করতে হবে।

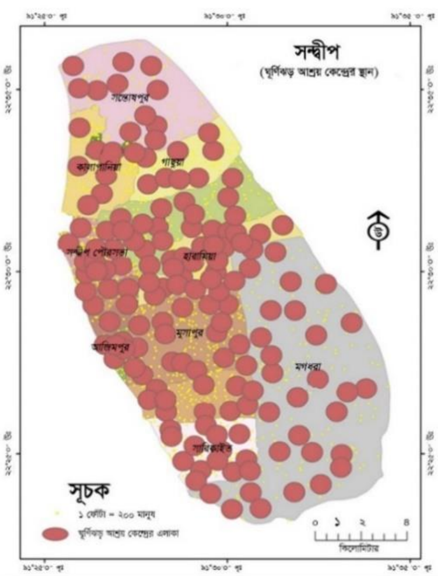

চিত্র ৩: জনসংখ্যা ও আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাব অঞ্চল

নদী ভাঙ্গন ও পলি সঞ্চয়

নদী ভাঙ্গন ও নদী সঞ্চয় সন্দ্বীপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নদী ভাঙ্গন না বলে নদী-সমুদ্র ভাঙ্গন বলাই শ্রেয়। কারন সন্দ্বীপের উপকূল ভাঙ্গনের জন্য নদী আর সমুদ্র উভয় স্রোতই দায়ী। গবেষণা লব্ধ ফলাফল থেকে আমরা নিমোক্ত চিত্রটি (চিত্রঃ ৪) পাই। মেঘনা থেকে আগত শক্তিশালী স্রোত সরাসরি সন্দ্বীপে পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিম উপকূলে আঘাত করে। সরাসরি আঘাত না করার কারণ সমুদ্র বায়ুর বেগ এবং এর গতিপথ।

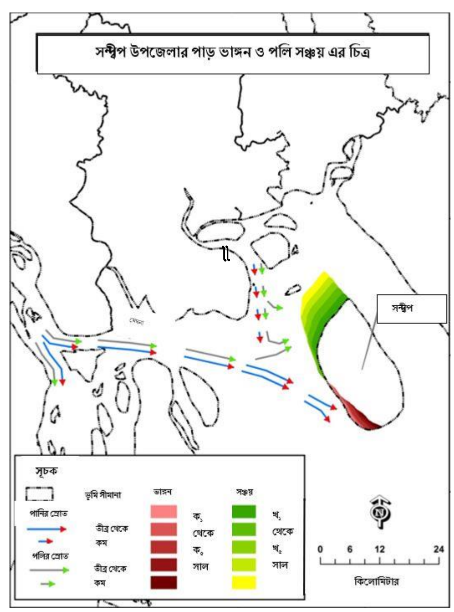

চিত্র ৪: সন্দ্বীপ উপকূলে স্রোত, পাড় ভাঙ্গন ও পাড় সঞ্চয়

অপরদিকে মেঘনার আর একটি শাখা বামনী নদী থেকে আগত দুর্বল স্রোত বাতাসের গতিবেগ এর কারনে আরো গতি হারায়। তাই বয়ে নিয়ে আসা পলিমাটি উপকূলে জমা হয়ে সৃষ্টি করে নতুন ভূমি। কাদার স্তর বা কম পানির স্তরটিকে স্যাটেলাইট চিত্রে খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। নিচে উদ্দীপকের ভাঙ্গা গড়ার পরিমাণের একটি তালিকা দেওয়া হলো, তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সন্দ্বীপে বাম থেকে নিচের দিকে ভাঙ্গছে এবং উদ্দীপকে বাম দিকে তা একীভূত হচ্ছে। ভাঙ্গার থেকে গড়ার পরিমান বেশি হলেও কালের আর্বতে বর্তমান সন্দ্বীপ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এই নদী ভাঙ্গন দ্বারা। তবে বর্তমানে নদী ভাঙ্গন এবং পলি সঞ্চয় এর হার উল্লেকযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে 2014 সালের পরের স্যাটালাইট ইমেজ পর্যবেক্ষন করলে আমরা নদী ভাঙ্গন বা পলি সঞ্চয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাই না। নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ দেখা যায়নি। কোন বাঁধ নেই, নেই কোন অবকাঠামোগত উন্নয়ন। অতএব, এখানকার বাসিন্দাদের নদী ভাঙ্গন চেয়ে দেখা ছাড়া করার অন্য কিছুই আর থাকে না। তবে এখানে গ্রীনবেল্ট এর আওতায় সবুজ বনায়ন হতে পারে একটি উল্লেখযোগ্য সমাধান। যেসব গাছপালা মাটির ভিতরের বাঁধন মজবুত করে উপকূল জুড়ে যদি সেই রকম বনায়ন করা যায় তবে অনেকাংশে উপকূল ভাঙ্গন রোধ হবে। তাছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বাঁধ তৈরি হতে পারে একটি টেকসই সমাধান। অপরদিকে নদী সঞ্চয়ের দরুন জমাকৃত পলি অনেকাংশই ক্ষয় পুষিয়ে দিচ্ছে। তবে এজন্য দরকার একটি পরিকল্পিত এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা।

সাল	পাড় ভাঙ্গার দিক	পাড় ভাঙ্গার পরিমাণ (বর্গ কিমি)	সঞ্চয়ের দিক	সঞ্চয়ের পরিমান (বর্গ কিমি)
১৭৬০-১৯৩০	উত্তর থেকে উত্তর-পূর্ব	৭.০৭	উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম	৬.১৪
			উত্তর (উপরের অংশ)	৬.০৪
			উত্তর	১০.৭৫
১৯৩০-১৯৭৪	উত্তর থেকে উত্তর-পূর্ব	২.৪২	-	-
	পূর্ব	০.৫৬		
	উপড়ের অংশ	১৬.২৩		
	দক্ষিণ-পূর্ব	২.১৬		
১৯৭৪-২০১৪	দক্ষিন-পূর্ব	২.১৪	উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম	১.৬৮
	উত্তর থেকে উত্তর-পূর্ব	২.১৬		
২০১৫-২০২২	উত্তর থেকে উত্তর-পূর্ব	০. ৩৪	উত্তর	০. ০৭
			উত্তর-পশ্চিম	০. ১৬

সারণি ২ঃ সন্দ্বীপে পাড় ভাঙ্গন ও সঞ্চয় এর পরিমাণ (সূত্র- ভুগোল পত্রিকা, সংখ্যা ৩৩, ২০১৪ ও গবেষক)

নতুন ভূমি বা স্থলভাগ সৃষ্টি

নিম্নের চিত্রে (চিত্রঃ ৫) দেখা যাচ্ছে কম উচ্চতা থেকে তোলা বা জুমইন করা স্যাটেলাইট ইমেজে যা দ্বারা পানির তলদেশে পলিমাটি দেখা যাচ্ছে। অতএব এটি প্রমাণ করে যে, পানি এখানে অগভীর। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায় ভাটার সময়ে যে কাঁদা থাকে তা প্রায় চর হাইমের কাছে পৌছে যায় এবং কাঁদা পেরোলে মাত্র ২০ মিটারের মতো পানি থাকে। এটি হতে পারে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। একটি দ্বীপ ক্রমে মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে। তবে এই বৃদ্ধি তরান্বীত করার জন্য দরকার টেকসই এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। কারন মূলখন্ডের সাথে যুক্ত হলে যাতায়ত ব্যবস্থার সর্বোপরি উন্নয়ন সাধন হবে। কারন এখনো সন্দ্বীপের সাথে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো জলপথ। চট্রগ্রাম সদরঘাট ও কুমিরা ঘাট থেকে লঞ্চ, স্টিমার ও স্পিডবোটে করে সন্দ্বীপে যেতে হয়। যদিও কুমিরা থেকে সন্দ্বীপ পর্যন্ত একটি উড়াল সড়ক বা ব্রীজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু তা আদৌ সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয়। নদী বা সমুদ্র শাসন করে ব্রীজ তৈরি খুবই ব্যয়বহুল। তা পরিবেশের জন্যে যথেষ্ট

চিত্র ৫ঃ সন্দ্বীপের উপকুল এলাকায় কাদা মাটির সঞ্চয় ও স্থানিক বৃদ্ধি (উৎস: গুগোল ইমেজ)

ক্ষতিকারকও বটে। যদি চর হাইমের মাধ্যমে সন্দ্বীপ মূল ভূখন্ডের সাথে জোড়া লাগে তবে যথাযথ ও সময় উপযোগী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একে কাজে লাগিয়ে সড়ক নির্মান করা যেতে পারে। তাহলে অন্তত মালামাল পরিবহনের জন্য সড়ক ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ জলপথে মালামাল পরিবহন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। তাছাড়া যোগাযোগের পরিব্যপ্তি বাড়লে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে উন্নয়নের নতুনদ্বার উন্মুক্ত হবে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, নদী ভাঙ্গন বাংলাদেশের একটি সাধারন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তা কতটা যে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরন হল সন্দ্বীপ। যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে ফলাফল হতে পারে আরো ভয়াবহ। আমরা আরো দেখতে পেয়েছি, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বনায়ন অথবা স্থায়ী বাঁধ

নির্মান হতে পারে এই নদী ভাঙ্গন রোধের একটি টেকসই সমাধান। তাছাড়া পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট নতুন স্থলভাগের জন্য দরকার যথাযথ ও আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা। কৃত্রিম উপায়ে পলি সঞ্চয় এর মাত্রা বাড়িয়ে সন্দ্বীপের মূলভূখন্ডের সাথে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় নাকি তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

উপসংহার

সন্দ্বীপ বিছিন্ন কিন্তু প্রকৃতির প্রাচুর্যময় একটি ভূখন্ড। চারদিকে জলবেষ্টিত এই ভূখন্ডের সহজ সরল মানুষগুলো প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে আসা বিভিন্ন দুর্যোগের সঙ্গে। কখনো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সবকিছু কখনো আবার প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব। এর মাঝেই আবার আশার আলোর মতো জেগে উঠেছে নতুন কিছু ভূখন্ড। বঙ্গোপসাগর ও মেঘনা নদীর মোহনায় একটি দ্বীপ বলে সন্দ্বীপে দুর্যোগের ঝুঁকি আরো বেশি। এই গবেষণাতে সন্দ্বীপের মানুষের দুর্যোগের কথাই তুলে ধরা হলো। যথাযথ নিয়মে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাই পারে দুর্যোগের ক্ষতি হ্রাস করতে। তেমনি সন্দ্বীপের ক্ষেত্রেও দরকার সে ব্যবস্থাপনা। এই গবেষণাতে উঠে এসেছে আশ্রয়কেন্দ্র পূর্নঃনির্মাণ, বনায়নসহ কিছু প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা। নতুন কিছু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। আবার কিছু এলাকায় প্রয়োজনের থেকে বেশি আশ্রয়কেন্দ্র আছে যা অন্যান্য সরকারি ও জনকল্যানমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করার সময় উক্ত এলাকার যাতায়ত ব্যবস্থা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব মাথায় রাখতে হবে। প্রতিটি মানুষ যথা সময়ে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে পৌছাতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় জন সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। একটু উঁচু জায়গায় যাতে বাড়িঘর বানায় সেদিকে সবার লক্ষ্য রাখতে হবে। নয়তো জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে প্রচুর। তাছাড়া উপকূলবর্তী এলাকা বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকায় জনবসতি স্থাপন করা যাবে না। তাহলে ভাঙ্গন এবং ঘূর্ণিঝড় উভয়ই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। উপকূল থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাড়িঘর স্থাপনের জন্য সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। উপকূলবর্তী এলাকা যেখানে ভাঙ্গনের পরিমাণ বেশি সেখানে ঘন করে গাছপালা লাগাতে হবে। তাছাড়া উপকূলবর্তী এলাকা যেখানে জোয়ার পরবর্তী কাঁদামাটি থাকে, যেমন পূর্ব উপকূলে সেখানে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা যেতে পারে। গাছপালা যেমন নদী বা সমুদ্র ভাঙ্গন কমায় তেমনি ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণও কমায়। নদী সঞ্চয় ও মূল ভূখন্ডের সাথে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি গভীর গুরুত্বের সাথে আমলে নেওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সরকারের উচ্চ মহলে জানানো ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্যোগ নিতে হবে। সন্দ্বীপে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভবনা অনেক বেশি। যদি সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তবে পুরো সন্দ্বীপ বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে যেতে পারে। তাই সর্বোপরি সরকারের উচ্চ মহলের এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। সর্বোপরি প্রয়োজন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগ। সকল স্তরে, সকল বয়সী সবাইকে বিভিন্ন দুর্যোগের ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। একই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপ ও কার্যাবলীর সাথে সবার পরিচয় ঘটাতে হবে। সবার মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ছড়িয়ে দিতে হবে। তবে এসব ব্যবস্থাপনা তখনি সুফল বয়ে আনবে যখন প্রশাসন ও জনগন একত্রে এই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহন করবে। আর এর মাধ্যমে সন্দ্বীপে যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সূচনা ঘটবে যা দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই দ্বীপটি সামুদ্রিক সম্পদের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে যদি দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমনের টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হয় ও বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গৃহিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

Akhter. N. et al. (2014), Analysis and mapping peripheral changes of Sandwip Island for erosion and accretion. JU bhugol and poribesh sommikhhon. 33:2014

Alam. N. (2009), Population growth and land use changes in island: A case study of Sandwip, Unpublished Ms thesis, Department of Geography and Environment.

Anderson, J. R. (1976). *A land use and land cover classification system for use with remote sensor data* (Vol. 964). US Government Printing Office.

Banglapedia. (2013), (CD version): National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic society of Bangladesh, publishing Co. ltd. Dhaka, 1000. Bangladesh.

BBS. (2013), Statistical yearbook of Bangladesh-2011, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka

Burrogh. M. (1986), Land Use Land Cover Mapping Through Digital Image Processing of Satellite Data – A case study from Panchkula, Ambala and Yamunanagar Districts, Haryana State, India.

Chowdhury. M. A. et al. (2015) A Study Of Cyclone Shelters In The Coastal Bangladesh: An Assessment From Gender Perspective. International Conference on Gneder, Diversity and Development.

Civco, D. L., Hurd, J. D., Wilson, E. H., Song, M., & Zhang, Z. (2002, April). A comparison of land use and land cover change detection methods. In *ASPRS-ACSM Annual Conference* (Vol. 21).

Das, S. (2012), Oceanograpy of Bangladesh, page 74-82

Ofori, G. (2002), CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT FOR DISASTER PREVENTION AND RESPONSE. Semanticscholar.org

Irtifa. N. A. (2014), Sandwip is changing shape through bank erosion, RS Mouza based study, Unpublished Ms thesis, Department of Geography and Environment.

Jensen. J. R. (1986), Introductory Digital Image Processing. Prentice Hall, New Jersey. 379 p.

Khan, S. (2014), Contextualiing an Isolated Islan, Case study of Sandwip, Unpublished Ms thesis, Department of Geography and Environment.

Khan. S. et al. (2012). Land Use Pattern of an Isolated Islan, Case of Sandwip. Jahangirnagar Review. Vol- 2012

Likens. W and Maw. K. (1982), Hierarchical modeling for image classification. Proc. of Remote Sensing with Special Emphasis on output to Geographic Information Systems in the 1980s., PECORA VII, South Dakota, U.S.A. 1982, pp. 290- 300.

Pelling M & Juha I. Uitto. Small island developing states: natural disaster vulnerability and global change. Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards. Volume-3, Issue- 2. Pages 49-62 . Published online: 15 Jun 2011

Mathur. H. S. and Binda, P. R. (1990) Land resource evaluation by remote sensing. Pointer Publishers, Jaipur, India.

Moshen. A. (1999), Coastal Geography: Coastal Land Use and Vulnerability. Journal of Geography and Geo-morphology. Vollume-3.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪০:২০২১ (পৃ. ৫৯-৬৮)
Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 40:2021 (pp 59-68) *ISSN 1027-8567*

The nature and mitigation process of Disasters on an isolated Island: A GIS and Remote Sensing based research on Sandwip Upazila.

Md. Sanjid Islam Khan[1], Kazi Newaz Mostofa[2], Farzana Zannat[3]

[1] Assistant Professor, Department of Disaster Management, Begum Rokeya University Rangpur. sikhan@brur.ac.bd
[2] Assistant Professor, Department of Economic, Begum Rokeya University Rangpur. Knm.eco@brur.ac.bd
[3] Lecturer, Department of Statistics, Begum Rokeya University Rangpur. Farzana.stat93@brur.ac.bd

Sandwip is an isolated Island situated in Chattogram district in Bangladesh, which is also a Upazila of Bangladesh in an administrative manner. Sandwip has suffered from various natural disasters over the year due to its geographic location and dynamic physiographic characteristics. This island is at the estuary of the Bay of Bengal and the mighty river Meghna, so the opposite currents in the estuary occur intensive bank erosion on the northwest side of the Island. Meanwhile,, the riverine sediments create new lands in the north-east region, which is by any means a unique geographic incident. This research aims to do a comparative analysis of cyclone vulnerability and mitigation procedures in Sandwip, as well as the cause and intensity of bank erosion in Sandwip. GIS has been used to identify and analyze the spatial distribution of the cyclone shelters in Sandwip, and integrated RS, and GIS techniques have been used for historical analysis and dynamism of the bank erosion throughout the years. We find the main reason behind both sedimentation and erosion is the velocity imbalance due to the opposite direction of the currents in the estuary. This accelerates the speed of the water at the west bank resulting the erosion, and slows down the speed on the east bank, resulting the sedimentation. Along with that,, the sedimentation creates the probability of the merging of the east bank to the adjacent land mass, which is the geographically most significant phenomenon. But another significant change occurred after 2014, which indicates a comparatively low amount of erosion and depositions. We also find that the cyclone shelters in Sandwip are not adequate and not well distributed. To solve the problem, we need sustainable disaster mitigation and adaptation plans. Offshore plantation may be the best solution. The disaster mitigation and adaptation process must be unique considering the geographic location and orientation of Sandwip. So proper mitigation and adaptation plan for Sandwip might be an example for all the islands of the country.

Keywords: Sandwip, Island, disaster, cyclone, GIS.

[1]Corresponding address: ✉ sikhan@brur.ac.bd